হজরত খানবাহাদুর আহ্ছান উল্লা (রঃ) এঁর -

ছুফী দর্শন

ড. এস এম খলিলুর রহমান * কামরান চৌধুরী **

স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে আধ্যাত্মিক ধ্যান ও জ্ঞানের মাধ্যমে জানার প্রচেষ্টাকে ছুফী দর্শন বা সুফিবাদ বলে। হযরত ইমাম গাজ্জালি (রঃ) এর মতে আল্লাহ ব্যতীত অপর মন্দ সবকিছু থেকে আত্মাকে পবিত্র করে সর্বদা আল্লাহর আরাধনায় নিমজ্জিত থাকা এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহতে নিমগ্ন হওয়ার নামই সুফিবাদ। আরবি 'সুফ' অর্থ পশম আর তাসাওউফ অর্থে পশমি বস্ত্র পরিধানের অভ্যাস। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষ কিছু সাহাবী বাড়ি ঘর ও জাগতিক সকল বিষয় বিসর্জন দিয়ে সার্বক্ষণিকভাবে দীনি শিক্ষা ও দীন প্রচারে আত্মনিয়োগ করে মসজিদে নববী এর বারান্দায় অবস্থান করতেন, যারা আসহাবে সুফফা নামে পরিচিত। আসহাবে সুফার নামের সাথে মিল রেখে তাদের 'সূফি' তথা আসহাবে সুফফার অনুসারী নামে ডাকা হতো।

ছুফী সাধকদের সকল কর্ম ও চিন্তা চেতনা স্থান-কাল বহির্ভূত। তাঁদের বাণী তাঁদের ভাবনা ও কাজ সব সময় সত্যপথের নির্দেশনা দেয়- যা সর্বকালে সকলের জন্য অনুসরণীয় ও অনুভবনীয়। তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া আধ্যাত্মিক ঘটনাসমূহ জানা ও আলোচনার মাধ্যমে ঐশী প্রেমের আলোচ্ছটায় আত্মা উদ্ভাসিত হয়, পাওয়া যায় আত্মীক প্রশান্তির সুশীতল পরশ। "সুফীর প্রভু সকল জগতের প্রভু, তিনি কোনো বিশেষ জাতির প্রতিপালক নহেন, তিনি সকল আলমের প্রতিপালক। তিনি সকল বিশ্বের একমাত্র প্রভু। তাঁহারই সমস্ত মহিমা, সমস্ত শক্তি, সমস্ত মাহাত্ম্য। সকল সৃষ্টজীব একই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। অন্য কোন ধর্ম এই বিশ্বজনীন ভাব কার্যে পরিণত করতে সমর্থ হয় নাই। প্রকৃতি একত্বের পরিচায়ক। উদ্ভিদ জগৎ, প্রাণী জগৎ, জড় জগৎ একই নিয়মের অধীন। গ্রহ, উপগ্রহ, নদী, পর্বত পরস্পর বিভিন্ন হলেও একই বিধানের অনুবর্তী। সৃষ্ট বস্তুর বহুত্বের মধ্যে একত্ব সর্বদা বিরাজমান। সুফীমত এই বিশ্বজোড়া একত্বের পরিপোষক।" [১]

যে ব্যক্তি জগতের কার্যাবলীর মধ্যে আল্লাহ ব্যাতীত অপর কাহারও দখল দেখে না সেই ব্যক্তিই একেশ্বরবাদী। আল্লাহতালার একত্বে বিশ্বাস করার নামই তাওহীদ। আল্লাহর উপর সর্বান্তকরণে স্বীয় ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন করাই তাওয়াক্কেল। কোরআনে রয়েছে-"তোমরা যদি মোমেন হও, তবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কেল কর। নিশ্চয় তিনি তাওয়াক্কেলকারীদের ভালোবাসেন।" মুখে খোদার একত্ব স্বীকার করলে তাওয়াক্কেল জন্মে না। যিনি অন্তরের সহিত একত্ব মানিয়া লইয়াছেন কিংবা তাহা মোশাহেদা (জ্ঞানচক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ) করিয়াছেন তাহারই তাওয়াক্কেল সত্য ও প্রকৃত। [২]

আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস আসলেই ঈমান কামেল হয়। ঈমানের চারটি অবস্থা। এই চার অবস্থাকে একটি বাদাম বা আখরোটের সাথে তুলনা করা যায়। বাদামের বাইরের অংশ শক্ত ছিলকা, উহার অভ্যন্তরে কোমল শ্বাস, শ্বাসের উপর একটা খোসা ও উপর অন্তরে তৈলাক্ত সার পদার্থ। প্রথম শ্রেণির লোক মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে, অন্তকরণের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না। ইহা বাদামের বাইরের ছিলকার ন্যায়। কেবল অভ্যন্তরস্থ শাঁসকে তাজা রাখে। এরা মুসলমান বলে পরিচিত এবং কুফরী হতে মুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণির লোকে পিতামাতা বা আলেমদিগের মুখে শুনিয়া 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এই কলেমার উপর প্রত্যয় করে এবং তাদের উপর ভক্তি থাকায় তাঁহাদের কথা মানিয়া লয়। সাধারণ ব্যক্তিগণ এই শ্রেণিভূক্ত। বাদামের খোসা দেখে ভিতরের শাঁসের পরিচয় পাওয়া যায়। খোসা মোলায়েম দেখলে শাঁসটি তাজা আছে বলে বিশ্বাস জন্মে। তাজা খোসা প্রায় শাঁসের তুল্য। তৃতীয় শ্রেণির লোক কলেমা তৈয়বকে মোশাহেদা করে অর্থাৎ সৃষ্টবস্তুর মধ্যে স্রষ্টার নিদর্শন দেখতে পায়। আল্লাহকে সকল বস্তুর কর্তা মনে করে। এই ধরণের ঈমানই পোক্ত। বাদামের অভ্যন্তরস্ত শাঁসের সাথে তুলনা করা হয়। চতুর্থ শ্রেণির লোক আরেফ নামে অভিহিত। প্রত্যক্ষ দর্শনই প্রকৃত তাওহীদ নামে আখ্যাত। আরেফ সর্বত্রই স্রষ্টাকে উপলব্ধি করে। তাঁহারই বিদ্যমানতা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর বিদ্যমানতা তাহার দৃষ্টিতে আসে না। এই অবস্থাকে ফানা বলে। [৩]

পরমাত্মা জ্ঞান- স্বীয় অস্তিত্বকে ভূলিয়া যাওয়ার নামই ফানা। সুফি স্বীয় হাস্তি ভুলিয়া প্রভুর স্মৃতিতে এমনভাবে আসক্ত মিলিত বা লুপ্ত হয় যে স্বীয় অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যায়। প্রেমিক প্রেমের প্রাবল্যে ডুবিয়া গিয়া একমাত্র প্রিয়জনের চিন্তায় এরূপ মগ্ন হয় যে, পরিশেষে যখন প্রিয়জনের ধ্যানটি তার হৃদয়কে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তখন সে হৃদয়ে আর কোনো পদার্থের স্থান হয় না। যে অবস্থায় মানব বিস্মৃত সমুদ্রে ডুবিয়া একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত পদার্থকে হারাইয়া ফেলে। সুফিগণ সেই অবস্থাকে ফানা নামকরণ করেন। এই অবস্থায় ছালেক এ আল্লাহ ব্যতীত আর কোন পদার্থই দেখিতে পায় না। [৪]

{* সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ** ইউনিক-২ প্রকল্প, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন]

হাদীসে আছে 'যে নিজেকে চিনেছে, সে তার প্রভুকে চিনেছে"। রবকে চিনতে হলে আগে নিজেকে নিজের চিনতে হবে। (কোন কিছু দেখা বা কোন বিষয় সম্পর্কে জানা মানেই চেনা নয়। শুধু জানলেও সেটাকে চিনা বলে না, আবার শুধু দেখলেও সেটাকে চিনা বলে না। তবে জানার চেয়ে দেখার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। দেখার আগে বর্ণনা শুনতে হয়, তবে দেখার পর আর বর্ণনা শুনতে হয় না, এমনিতেই চেনা যায়। নিজেকে জানতে পারলেই নিজেকে দেখা যাবে। আর তারপরই যাবে চেনা। আমার দেহটি আমি নই। দেহটি আমার। এই দেহের মাঝে যা কিছু আমার, তার কিছুই আমি নই; বরং সবই আমার। আমার আত্মা, আমার নফস, আমার দেহ, আর হৃদয় ইত্যাদি সব কিছুই আমার। কিন্তু এগুলোর কিছুই আমি নই। তবে আমাকে চিনার জন্য এইসব কিছুকে আগে চিনতে হবে এবং সবশেষে আমি আমাকে চিনতে পারব। নিজেকে চিনতে গিয়ে আমি সব কিছুকে জানবো ও দেখবো, তবুও নিজেকে দেখা আমার হয়ে উঠবে না। সাধনার এক পর্যায়ে আমি আমার মাঝে বিশ্বকে দেখতে পাবো, এমনকি এক পর্যায়ে আমি পাবো পরম প্রভুর দর্শন। কিন্তু তখনও আমি আমার দেখা পাবো। তারপর এক সময় দেখা যাবে আমি বলতে আসলে কিছুই নেই, সবই সে, আর সে-ই আমি। সবশেষে দেখা যাবে আমিই আমার আরাধনি করেছিলাম আমাকে পাওয়ার জন্য।

পরমাত্মা জ্ঞান হইতেই প্রকৃত আনন্দের উদ্ভব। চক্ষুর কার্য দৃষ্টি জনিত সুখ লাভ, কর্ণের কার্য্য সুমিষ্ট সু-সংযোগ গ্রহণ, কামের কার্য্য কু প্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধন। অন্যদিকে আত্মার কার্য্য সত্যের উপলব্ধিকরণ, ইহাতেই আত্মা প্রকৃত আনন্দ লাভ করে। পরমাত্মা হইতে কোনও বস্তু উৎকৃষ্টতর নহে। সুতরাং তাহার জ্ঞানও সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক। মৃত্যুর সহিত ইন্দ্রিয়াদির রুচি লোপপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু আত্মার তৃষ্ণা ক্রমে বর্ধিত হইতে থাকে।

আত্মা কেবল শরীরের বাহক, মনেবৃত্তিগুলিরও বাহক। বিবেক আত্মার প্রধান মন্ত্রীস্বরূপ। বিবেক ভালো-মন্দ বিচার করে। আত্মা চরকল স্বরূপ। যে আত্মা যত দুর্বল সে আত্মা তত প্রবৃত্তি কর্তৃক বশীভূত হয়। যে মানুষ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা পরিচালিত হয় তাহার অন্তরে মরিচা পড়ে। এই মরিচা উৎখাত করতে না পারলে উহাতে দিব্য রশ্মি প্রতিভাত হয় না। যাহারা কলবকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ হইতে যতই নির্মল রাখিবে তাহারা ততই এলহাম গ্রহণে সমর্থ হইবে।

ইসলামে সুফি দর্শন এ ধর্মের মরমী শাখা। হযরত মুহাম্মাদ স: এর দর্শন অনুযায়ী জ্ঞান দু'ধরণের জাহেরি ও বাতেনি। জাহেরি জ্ঞান সাধারণ মানুষের চর্চার বিষয়। বাতেনি জ্ঞান গুপ্ত বিষয়। স্রষ্টার নৈকট্য লাভের জন্য বিশেষভাবে ত্যাগ স্বীকার করা মানুষই বাতেনি বা গুপ্ত জ্ঞানের চর্চা করে থাকেন। বাতেনি জ্ঞানের চর্চার অন্য নাম মারেফতি শিক্ষা। সুফিরা মূলত বাতেনি জ্ঞানের চর্চা করে থাকেন। আর তাই সুফি সম্প্রদায় অগ্রগণ্য সম্প্রদায় হিসেবে ইসলামে মূল্যায়িত। হযরত মুহাম্মদ স: এর মূল শিক্ষা ধারণ করে বাতেনি বা গুপ্ত জ্ঞানের চর্চার মধ্য দিয়ে সুফিরা মহান সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করেন। আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্য দিয়ে তারা ব্যক্তিজীবন, আত্মীক জীবন ও ধর্মীয় জীবনের উন্নতি সাধন করেন। এবং এই শিক্ষা অনুসারীদের সাহায্যে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করেন। মিশন প্রতিষ্ঠাতা খানবাহাদুর আহছানউল্লা 'ছুফি' গ্রন্থ রচনা করে সাধারণ পাঠক, ভক্ত, অনুসারীদেরকে সুফি দর্শনের মূল কথা প্রচার করে গেছেন। কিভাবে একজন মানুষ ক্রমাগত চর্চার মধ্যদিয়ে পরিপূর্ণ মানবে রূপান্তরিত হতে পারেন তার দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। সুফিরা আধ্যাত্মিক সাধনার সাহায্যে আত্মিক উন্নতির মাধ্যমে ইহজাগতিক ও পরজাগতিক কল্যাণ সাধন এবং লব্ধ জ্ঞান মানবজাতির কল্যাণ ব্যয় করেন। এবং একটি অসম্প্রদায়িক হিংসা দ্বেষমুক্ত সমাজ তৈরি করেন।

"মানবের একটি ষষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, যদ্বারা সে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য ও মহত্ব অনুভব করিতে পারে। আঁ হযরত খোশবু ও স্ত্রী লোককে বেশী ভালবাসিতেন। তদপেক্ষা তিনি ইবাদত অধিকতর ভালোবাসতেন। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার সৌন্দর্য ও পূর্ণতা উপলব্ধি করিয়াছে, তাহার নিকট বাহ্যিক কোন সৌন্দয্য হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না। অবয়বের সুগঠন সুন্দর বটে, কিন্তু চরিত্রে মাধুর্য্য তদপেক্ষা সুন্দর। মৃত আত্মাকে আমরা ভালোবাসি, তাহাদের বাহ্যিক সৌন্দর্য্যর জন্য নহে তাহাদের আভ্যন্তরীণ গুণের জন্য।" [৫] পরমাত্মা সর্বগুণের পূর্ণত্বের প্রকাশ। মানবাত্মা তাহারই ছাঁচে গঠিত। সেও পূর্ণত্ব লাভের জন্য অনন্তকাল চেষ্টা করবে।

সুফিবাদের প্রধান প্রত্যাশা হলো স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভে ধন্য হওয়া। প্রত্যাশার সেই চূড়ায় উপনীত হওয়ার জন্যই সুফিদের ক্লান্তিহীন অবিরাম পথচলা। সে পথটির নামই তরিকত। তরিকতের সাত মনজিল বা মোকাম যথাক্রমে তওবা (কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা, ক্ষমা প্রার্থনা), অরা, যুহ্দ, ফাক্র, সাব্র, তাওয়াক্কুল, আর রোযার সাধনার মাধ্যমে সুফিরা উপনীত হন তাদের কাঙ্খিত মনজিলে মকসুদে। এই সপ্তধাপ অতিক্রম করতে তাদের মুখোমুখি হতে হয় আরও দশটি অবস্থার। যেগুলো হলো : মোরাকাবা, কুর্ব বা নৈকট্য, মহব্বত, খাউফ বা ভয়, রেজা, শওক, উন্স, এত্মিনান, মোশাহেদা ও ইয়াকিন। কোনো একজন সুফি যদি এসবের প্রতিটি মনজিলে অবস্থান করে সাধনার অভিজ্ঞতা অর্জন না করে এবং প্রতিটি

অবস্থার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে পবিত্র, পরিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ না করে, তাহলে তার পক্ষে তরিকতের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

পারস্যে সুফিবাদের উত্থান ও বিস্তৃতিকালেই সিরিয়া, মিসর, তুরস্ক এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে এ মতবাদের প্রসার ঘটে। ভারতীয় উপমহাদেশে সুফিবাদের আগমন, প্রভাব ও প্রসার- এ গতিরই একটি স্বাভাবিক পরিণতি। খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে সুফিবাদ প্রবেশ করে। খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি রহঃ সহ আরো অনেকে এই উপমহাদেশে সুফি মতবাদ প্রচার করেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা নিজেও খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতির (রঃ) এর ভীষণ অনুরক্ত ছিলেন।

সুফি সাধক খান বাহাদুর আহছানউল্লা (রঃ) বলেন, "এই সংসারের মধ্যে অবস্থিতি কর, কিন্তু সংসার-কীট সাজিও না। তোমার সমগ্র চিন্তা শক্তি আত্মার উন্নতির পথে নিয়োগ কর, তবেই জাগতিক কর্তব্য প্রকৃতরূপে প্রতিপালিত হবে।" আত্মিক শক্তি ধারণের জন্য দেহের সৃষ্টি। আত্মাতেই সকল প্রকার গুপ্ত শক্তি নিহিত, উহার ক্রমিক বিকাশই জীবনের উদ্দেশ্য ।[৬] পরম শক্তির বীজ আত্মাতে উপ্ত, শরীরের সাহায্যে উক্ত শক্তির বিকাশ মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি দুনিয়ার কোন জিনিসকে কোনদিন ঘৃণা করতেন না, আল্লাহর সৃষ্টি বলে। পরমাত্মা জ্ঞান লাভ মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। পরমাত্মা জ্ঞানের তিনটি মার্গ, জ্ঞান-মার্গ, কর্ম-মার্গ ও প্রেম মার্গ। দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানবল দ্বারা ঐশ-জ্ঞান লাভ করে, কর্মী পুরুষ সুকর্ম দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে চায়। আর প্রেমিক আত্ম-জ্ঞান বিসর্জন দিয়ে প্রেমময়ে আত্ম সমর্পণ করে।

"মানব- আত্মা ও দেহের সমষ্টি। আত্মা 'পুরুষ' ও দেহ 'প্রকৃতি' নামে পরিচিত। একটি স্বর্গীয় ও অপরটি পার্থিব। একটি মহাপ্রভু হইতে আগত; অপরটি মৃন্ময় উপাদান হইতে উৎপন্ন। একটি স্থায়ী, অপরটি অস্থায়ী। মৃত্যুর সহিত দেহের অবসান, মৃত্যুর পরেও আত্মার স্থিতি"। [৭] আত্মা প্রবৃত্তির উপর সওয়ার হতে চায়, আর প্রবৃত্তি আত্মার উপর প্রভূত্বের প্রয়াসী। আত্মা পরমাত্মা হতে নিঃসৃত এবং তারই আদেশে পরিচালিত।

"মানব প্রবৃত্তির দাস। আত্মা প্রবৃত্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করে। মানবতার জীব প্রবৃত্তির দ্বারাই পরিচালিত হয়। প্রবৃত্তি তাহাকে যেদিকে চালিত করে, সে সেই দিকে চালিত হয়, সে সেই দিকে ধাবিত হয়। আত্মার নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে পাপ ও পূণ্যের পার্থক্য লুপ্ত হত, স্বর্গ নরক অর্থহীন হত, প্রলয় ও পুনরুত্থান অনাবশ্যক হত, কেবল আমিত্ব বিরাজ করত।" [৮]

মিশন প্রতিষ্ঠাতা বলেন- কথায় ও কাজে জগতের জীব এবং নির্জীব সকলকে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে অনুগৃহীত করতে হবে। স্বার্থকে চিরতরে বলি দিয়ে নিজকে পরের জন্য বিলিয়ে দিতে হবে। তবেই হৃদয়ে স্পন্দন আসবে, কলবের তড়প বাড়বে, অশ্রুজলে শরীর পূত হবে, দীর্ঘ-নিঃশ্বাসে আত্মার প্রসার হবে। পুরস্কারের লিপ্সা সম্পূর্ণরূপে হৃদয় হতে উৎপাটিত করতে হবে। তবেই মহব্বত পোষকতা পাবে। মহব্বত যত পুষ্ট হবে আত্মা ততই সঞ্জীবিত হবে। আত্মার পূর্ণ প্রসার হলেই তাতে পরমাত্মার বিকাশ হবে।

"শরীরের ছয়টি স্থান যথা- কলব, রুহ, ছির, খফি, আখফা ও নফছ; ইহারা লতিফা নামে অভিহিত। পীর-মুর্শিদ, মুরীদের কলবে যে আছর অর্পণ করেন, তাহাকে তাওয়াজ্জোহ বলে। এতে মুরীদের কলব মোরাকাবার নূরে আলোকিত হয়। ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত, মোস্তাহাবগুলি পালন করলে, হারাম হালাল ও সন্দেহমূলক কাজগুলি ত্যাগ করলে জিকির ও মোরাকাবার সুফল সহজে লাভ হয়"। [৯]

প্রবৃত্তি দমন, কাম বৃত্তি, ক্রোধ লোভ, বদ-মেজাজ, জিহ্বার অপব্যবহার, গীবত, অহংকার পরিহার করা। লোভ লালসা, ঈর্ষা, হিংসা, কৃপণতা, অতিরিক্ত ভোজনস্পৃহা, রিয়া (লোক দেখানোর জন্য যে কোনও সৎ কাজ করাকে রিয়া বলে) পরিত্যাগ করা। সংসার আসক্তি পরিত্যাগ করা। বেশকিছু সৎগুণের অধিকারী হতে হয়।

ছুফিগণ সতত ইসলামের প্রকৃত তত্ত্ব অন্বেষণে ব্রতী। নামাজ তাদের নিকট মিরাজ স্বরূপ। হুজুরী (তন্ময়তা) সাধন করতে হলে একোদ্দিষ্ট চিন্তার আবশ্যক। সমস্ত মানসিক স্রোতকে একক সন্নিবেশিত করে এক মনে, এক লক্ষ্যে, মাহবুবের সহিত তন্ময়তা লাভ করাকেই হুজুরী বলে। একে সাধন করতে হলে কেবল জিকির আজকার, দরুদ পাঠ, চিল্লাগ্রহণ, এতেকাফ প্রভৃতি যথেষ্ট নয়। অবিরত চেষ্টার দ্বারা মানসিক চিন্তার উপর প্রভূত্ব লাভ এবং একাগ্রতা সম্পাদন করতে পারলে পথ সুগম হয় ।[১০] "মানব তিন শ্রেণির- প্রথম শ্রেণি (নফসে আম্বারা) পশ্বাদির ন্যায় স্বীয় প্রবৃত্তির দাস। দ্বিতীয় শ্রেণি (নফসে লওয়াম্মার) অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে কেবল স্বীয় অধিকার লাভ করেই সন্তুষ্ট থাকে। তৃতীয় শ্রেণি-(নফসে মোতমইন্নার) অধিকারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে জগতের মঙ্গল সাধনে সর্বদা ব্যস্ত থাকে।" [১১] এদের আমিত্ব জ্ঞান নেই। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু পরমাণুর সাথে এদের সন্তুষ্টি বিজড়িত। মহাপ্রভুর ইচ্ছা সাধন করতে হলে প্রেমিক হওয়া আবশ্যক।

প্রেমিক হতে হলে সমস্ত জগতের দাসত্ব করতে হবে এবং দাসত্বেই তৃপ্ত থাকতে হবে। তাহলে সমস্ত বস্তুতেই প্রেমময়ের সান্নিধ্য অনুভূত হবে।

প্রেমময়ের আরস তিনটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত- সত্যতা, পবিত্রতা ও প্রেমিকতা। যিনি এই ত্রিত্বের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তিনি পুণ্যরাজ্যে প্রবেশের অধিকার পেয়েছেন। এরা পরস্পর সংশ্লিষ্ট একটির আশ্রয় নিলে অপর দুটি সহজলভ্য হয়।[১২] আত্মা দেহ সংশ্লিষ্ট ও দেহ আত্মা সংশ্লিষ্ট। যে লোকেই হোক আত্মা কোনো না কোনো আকার ধারণ করে। 'রূহ ইহলোকেই থাকুক, ইল্লিনে থাকুক বা জান্নাতে থাকুক সে কোনো না কোনো অবলম্বন, কোনো না কোনো আধার অত্যাবশ্যক। সেই অনাদি অনন্ত রুহেরও সেই কথা। সে কোটি কোটি বস্তু মধ্যে নিহিত। লক্ষ লক্ষ জগৎ তার আধার। তাই সে সাকারে নিরাকার। যেখানে সাকার নেই, সেখানে নিরাকার অর্থহীন। সাকার নিরাকার একই বৃন্তে দুটি ফুল। একটি পত্রের দুটি পৃথক পৃষ্ঠা মাত্র। দৃষ্টির তারতম্য অনুসারে একই বস্তুকে দুই নামে অভিহিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এদের মধ্যে পার্থক্য নেই। সর্ববস্তুতে অন্তর্নিহিত থাকে। অনন্ত প্রভু সর্বব্যাপী ও সর্বচৈতন্যময়। সব ছুরতে তিনি বর্তমান। ছুফি শরিয়ত ও মারেফতের ঝগড়া এক সঙ্গে মীমাংসা করেন। তিনি আধারে আধেয় দেখেন, সাকার নিরাকার উভয়কে একত্বের মধ্যে আনয়ন করেন।'[১৩]

বিজ্ঞান দেখে চক্ষু উন্মীলিত করে, আর ছুফি দেখে দৃষ্টি বন্ধ করে। সুতরাং ছুফি অতীন্দ্রিয় রাজ্যের ছটা দেখে বিমুগ্ধ হয়ে থাকেন। তা বিজ্ঞানের কল্পনার বহির্ভূত। বৈজ্ঞানিক অস্তিত্ব দেখে, আর ছুফি কেবলই অনস্তিত্ব দেখে। ছুফি মাহবুব ব্যতীত কিছুই দেখে না।[১৪] সে তাঁকে জাহের ও বাতেন বলে মনে করে, তিনিই প্রকাশ্য তিনিই অপ্রকাশ্য। প্রেমময় প্রেম নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসেন। তিনি যার উপর দয়া করেন, তাতেই আপন শক্তি ফুঁকিয়া দেন এবং তারই প্রভাবে আশেক-মাশুক মাতোয়ারা হয়। তাই প্রেম কখনো আশেকের আকার এবং কখনো মাশুকের আকার ধারণ করে।

গভীর সমুদ্রে ডুব দিলে তবেই সুবর্ণ কণার অনুসন্ধান পাওয়া যায়। গভীরতা দেখে ভয় করা ঠিক না। খানবাহাদুর আহছানউল্লা (রঃ) বলেন- পৃথিবীতে অমঙ্গল নাই। অমঙ্গল অপ্রেমিকের চোখে। মঙ্গলময় প্রেম করার জন্য, লীলা করার জন্য, মায়া করার জন্য যাকে সৃষ্টি করেছেন তাকে আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ অমঙ্গল নাম দিয়ে থাকি। দুটি হাতকে সমভাবে দেখ, কাকেও ঘৃণা করো না। উভয়ই আমাদের মঙ্গল হেতু। যে হাত ময়লা পরিষ্কার করে, সেও যেমন আদরের, আর যে হাত মুখে আহার পৌছায় সেও তেমনি আদরের। যদি বাম হাতের অভাব হয় তবে জীবন ভয়াবহ হয়ে উঠে। তাই প্রেমময়কে মঙ্গলময় বলে জানো, প্রেম দিয়ে তাকে অর্চনা কর। প্রেমিক হয়ে তার গুণে ভূষিত হও। চিন্তা কর, একোদ্দশ্যে চিন্তা কর, ব্যাকুলতা আন, অস্থিরতাকে আলিঙ্গন কর, সাহসী হও, ঝাঁপ দিয়ে পড়, তাঁরই হয়ে যাও। একবার প্রকৃতিকে নিয়ে নিভৃতে চিন্তা করতে আরম্ভ কর। একবার পাহাড়ের গুহায়, সমুদ্রের প্রবাহে, পাখির কূজনে, নক্ষত্রময় আকাশে, নিশিথের নিস্তব্ধতার তার খোঁজ কর, ব্যাকুলতাকে সহচর করে তাকে অনুসন্ধান কর। সাড়া পাবে, মুগ্ধ হবে। [১৫] পরমাত্মা শক্তি স্বরূপ প্রতি পরমাণুতে বিদ্যমান।

তিনি আরো বলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কে জীবনের মন্ত্র কর। একে আমল করতে হবে। কলেমা জানলেই মোসলমান হওয়া যায় না। কলেমাকে আমল করলেই প্রকৃত মোসলমান হওয়া যায়। যা কিছু দেখ, শুন, সবই তারই ইচ্ছার প্রকাশ। সবের মধ্যে সে আছে তোমাতেও আছে। তার সাথে নির্জনে আলাপ করবে, তার জন্য প্রত্যেক রাত্র কিছু সময় একাকী চিন্তা করবে ও কলবের দিকে লক্ষ্য করে ইন্দ্রিয়গুলির কাজ যথাসম্ভব বন্ধ রেখে এক মনে এক প্রাণে তাকে ধ্যান করবে। স্বার্থহীন ভালোবাসা দ্বারা মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করে। আল্লাহ সবাইকে সমাধিকার, সমান শক্তি দিয়েছেন। কারো শক্তি প্রকাশ্যমান আর কারো অপ্রকাশিত। অধ্যবসায়, পরিশ্রম, সৎচিন্তা ও সদনুষ্ঠান দ্বারা কেহ দরবেশী লাভ করে আর কেহ তদভাবে শয়তানে পরিণত হয়। [১৬]

শয়নে স্বপনে তাকে মনে করতে হবে। পাক শরীরে, পাক মনে তাকে ধ্যান করা। তারই হয়ে যাওয়া। মিলাদ শরীফে ভক্তির সাথে যোগদান করা। বিনা সুপারিশে কিছুই হাছেল হয় না। দরুদ শরীফ স্বর্গের সিঁড়ি, দুনিয়া ও আখেরাতের সংযোজক বস্তু। এর মাধ্যমে দুনিয়ার বেড়া সহজেই পার হওয়া যায়। সকলকে মহব্বতের সূত্রে গাঁথতে হবে। ছোট বড় ভুলে গিয়ে রোষ, লোভ, লালসা বিদায় দিয়ে মহব্বতের সেবক হও। এরূপ হতে হবে যাতে লোকে দেখলে আকৃষ্ট হয়, প্রশংসা করে। নিঃস্বার্থ ছোট বড় ধনী নির্ধনকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। কারো কুকৃতি না দেখা, নিজেদের ক্ষুদ্রতা ও সুকৃতি দেখা।

আল্লাহতা'লা সকল আলমের প্রতিপালক। সকল জীবের প্রতি তার সমদৃষ্টি তার নিচ জাতিভেদ বা শ্রেণিভেদ নেই। তিনি ধনী-নির্ধন সকলেরই আশ্রয় দাতা। তার ছাচে নিজেকে গঠন করলে মানব নামের বাচ্য হওয়া যায়। প্রতিবেশি, দুস্থ, পীড়িত, ক্ষুধিত জীবের খবর নিতে হবে, তাদের দুঃখ মোচন করতে হবে। হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান ও জীবজন্তু-ছাগল, গরু, কুকুর, বিড়াল, পাখি সকলেরই প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। এমন কি বৃক্ষ লতা, জড়, অজড় সকলের প্রতি সদয় থাকা।

কেবল দাড়ি রাখলে, টুপি পরলে মুসলিম হওয়া যায় না, শুধু নামাজ পড়লেও মুসলিম হওয়া যায় না। আসল বস্তু অন্তঃকরণ, মহব্বত। দুই হাতে মহব্বত বিলাতে থাকো। তবেই তাঁর দয়ার অধিকারী হবে। তবেই আত্মার লেটেস্ট শক্তি পেটেন্ট হয়ে দাঁড়াবে। প্রতি রাত্রে মোরাকাবা করলে, স্থিরচিত্তে বিভূগুণ স্মরণ করলে, সকল চিন্তা হতে মনকে বিকর্ষণ করে স্রষ্টাতে ফোকাস করতে চেষ্টা করা। তবেই তন্ময়তা লাভ হয়।

শরীর ও মনকে সর্বদা নির্মল রাখলে আত্মার স্ফুরণ ঘটে। মনকে পরিস্কার করে এবাদত করলে ফল অবশ্যম্ভাবী। হৃদয়ে প্রেম জাগলে রিপুগুলোর জড় কেঁটে যায়। যে হৃদয়ে খোদী আছে, সে হৃদয়ে প্রেম জাগে না। হাস্তিকে বিসর্জন দেয়া, খোদী থাকলে খোদা আসে না। এক অন্তরে দুই খোদা কিভাবে থাকবে ? খোদা ব্যাতীত সব বস্তুর চিন্তাকে পরিহার করা। উঠতে বসতে, শয়নে জাগরণে কেবল আল্লাহ আল্লাহ করতে হবে। তার চিন্তায় ডুবে যাওয়া। তবেই প্রেম বাড়বে, ততই হৃদয়ে প্রেমময়ের আভাস প্রতিভাত হবে। প্রেমের রাজ্যে ভাগাভাগি নাই, যিনি যত আমল করবেন, তিনি ততই পাবেন। সসীম বস্তুর হ্রাস আছে, অসীম বস্তুর হ্রাস নেই। সেখানে কম বেশীও নেই। [১৭]

মহব্বত মানুষকে এক মুহূর্তেই ইহলোক থেকে পরলোকে আস্বাদ দান সমর্থ। এ পৃথিবীতে মহব্বত অপেক্ষা মূল্যবান কোন বস্তু নাই এর দ্বারা মানুষ পৃথিবীকে বেহেশতে পরিণত করতে পারে। মানুষ পশু, পাখি, উদ্ভিদ সকলই খোদাতায়ালার দান। সকলেই খোদাতাআলাকে সেজদা করে। তবু মানুষ বুদ্ধির গরীমায় আল্লাহকে ভুলে থাকে। [১৮]

ভালোবাসা কেবল মানবে সীমাবদ্ধ না রাখা, চরেন্দা পরেন্দা পর্যন্ত বিস্তৃত করা। ক্ষুদ্রতম পিপীলিকার আহার যোগাইলে পর্বতসম মছিবত হতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। শারীরিক মরজের জন্য জীবের ছদকা গ্রহণীয়। সর্বজীবে দয়া বিস্তার করা সুফি দর্শনের কথা, খানবাহাদুর আহছানউল্লা একই মত পোষন করেন। দুর্বলতা আসলে খোদার নিকট মিনতি করে অতি দীনতার সাথে বল ভিক্ষা করা। যতই তার প্রতি ভক্তি জন্মাবে ততই শয়তানী ওয়াছওয়াা দূরে যাবে। [১৯]

প্রেম অনন্ত, যতই অগ্রসর হবে ততই এর পরিধি বিস্তৃত হবে। এটি ইহলোক ও পরলোকের সেতু। প্রেম সসীম মানুষকে অসীম রাজ্যে পৌঁছে দেয়। এর দহনও কাম্য। প্রেমিক যতই জ্বলবে ততই খাঁটি হবে। প্রেমাগ্নি আবর্জনাকে জ্বালিয়ে আত্মার পরিশুদ্ধি সাধন করে। পার্থিব চিন্তা আত্মাকে কলুষিত করে। উক্ত কলুষ অপনোদনের মহৌষধ প্রেম। যে হৃদয়ে প্রেম নেই সে হৃদয় শুষ্ক। তাতে সহজে স্বর্গীয় ভাব উন্মোচিত হয় না। চরিত্র খাঁটি না হলে আসক্তি প্রবল না হলে একোদ্দিষ্ট চিন্তা আসতে পারে না। অপরের অনিষ্ট সাধন না করলেই শরীয়ত সন্তুষ্ট, কিন্তু মারেফত অপরের ইষ্ট সাধন হেতু জীবন উৎসর্গ করতেও সঙ্কুচিত নহে। সমস্ত জড় জগতে মারেফত আত্মার পরিচয় পায় এবং সখ্য স্থাপন করে। [২০]

শৈশব থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খানবাহাদুর আহছানউল্লা আধ্যাত্ম চিন্তা ও সাধনায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। শুধু আল্লাহর সাধনাই নয়, তাঁর সৃষ্ট জীবকে ভালোবাসা, তাদের কল্যাণে আত্মনিবেদিত হওয়াতে মানব জীবনের পূর্ণত্ব- এই ছিল তার জীবন সাধনা। স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা এই মূলমন্ত্র নিয়ে তিনি আহছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বিরানব্বুই বছরের বর্ণিল জীবনপর্বকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়- তেইশ বছরের শৈশব ও শিক্ষাকাল, চৌত্রিশ বছরব্যাপী অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা বিভাগে সরকারি চাকুরীকাল এবং চাকরী থেকে অবসরগ্রহণের পর পঁয়ত্রিশ বছর সমাজসেবা ও আধ্যাত্ম সাধনাসহ ভক্তদের রুহানী সেবা দান।

তিনি দর্শন শাস্ত্রে এম.এ ডিগ্রি গ্রহণ করেন, বিভিন্ন ধর্মীয় দর্শন পড়েছেন, বিশ্লেষণও করেছেন। তিনি সচেতন, মেধাবী, উচ্চশিক্ষিত, স্বল্পভাসী ও আদর্শবাদী মানুষ ছিলেন। নীরবে পশ্চাৎমুখী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে উজ্জ্বল ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। খানবাহাদুর আহছানউল্লা এর সুফি দর্শনের বীজ জন্ম থেকেই রোপিত হয়। ইরান থেকে আগত মাওলানা ছুফি মোহাম্মদ আলী শাহ (যশোর জেলার নওয়াপাড়ায় ইরানী পীর নামে খ্যাত) এর নিকট পিতা মুনশী মোহাম্মদ মুফিজউদ্দীন বায়াত (শিষ্যত্ব) গ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর বহু পূর্বে তিনি স্বপ্নে (খানবাহাদুর আহছানউল্লা) ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইঙ্গিত এবং মোবারকবাদ দিয়েছিলেন।[২১] বাল্যকাল থেকে মিশন প্রতিষ্ঠাতা নামাজ পড়তেন এবং যার আরাধনা ছিল অন্যরা যেন তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চলে। চট্টগ্রামে অবস্থানকালে স্বপ্নযোগে মহাপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করেন। ১৯০৯ সালে আধ্যাত্মসাধক ছৈয়দ গফুর শাহ আল-হোছছামি আল ওয়ারেছির বাংলাদেশের চট্টগ্রামে পদার্পণ করলে তিনি সস্ত্রীক বায়াত গ্রহণ করেন। কর্মজীবনের বেশিরভাগ সময় ১২ আওলিয়ার স্থান খ্যাত চট্টগ্রামে অবস্থান করেন। সেখানকার পরিবেশ প্রকৃতি তাকে সুফি সাধনার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা দান করে। ' আঁ-হযরত সত্যই বলিয়াছেন যে, এক ঘন্টা তফক্কোর (সৃষ্টি রহস্য চিন্তা) সারা বছরের এবাদত থেকেও অধিক ফলপ্রসু। প্রকৃতি আশেকের শিক্ষাক্ষেত্র। এক একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষপত্র স্রষ্টার অবর্ণনীয় মাহাত্ম ঘোষণা করে।

সুফি বিষয়টির সাথে নিম্নোক্ত কিছু বিষয় জড়িত। এগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি। সুফি শব্দটির সাথে তাসাওউফ অতপ্রোতভাবে জড়িত। সুফি শব্দটি সুফ/সুফফা/সফ/সাফা/সুফিয়া শব্দ থেকে নির্গত। যার অর্থ যথাক্রমে- পশমী পোষাক পরিধানকারী, আসহাবে সুফফার অনুসারী, প্রথম সারিতে অবস্থানকারী ও সুশৃঙ্খল জীবনের অধিকারী, পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনকারী ও সত্যজ্ঞানী। সুতরাং তাসাওউফ হলো এসবের চর্চা করা, তাই মুসলিম সাধকগণকে সুফি বলা হয় এবং এই সাধনা কর্মকে তাসাওফ নামে অভিহিত। ইবাদতের দায়িত্ব কর্তব্য অনুভবের সাথে সাথে ভালোবাসার রস আস্বাদন তাসাওউফের মূল কথা। কোরআনে উল্লিখিত 'তাকওয়া' (আল্লাহ ভীতি বা সাবধানতা), তাযকিয়া (আত্মশুদ্ধি) এবং হাদীসে উল্লিখিত ইহসান (আত্মদর্শন ও আল্লাহর দর্শন) লাভের বিকশিত রূপ এবং শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত ও মারিফতের মিলনকেন্দ্র। এক কথায় ইবাদতের বাহ্যিক সৌন্দয্য বৃদ্ধি (সুন্নতের অনুসরণ) ও অভ্যন্তরীণ মানোন্নয়ন বা উৎকর্ষ সাধন (মহব্বত) এর মাধ্যমে প্রকৃত প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টি অর্জনের প্রয়াসে সদা লিপ্ত ও সে আকর্ষণে সর্বদা ব্যাপ্ত ও লিপ্ত থাকাই হলো তাসাওউফ।

শরীয়ত এর আভিধানিক অর্থ- পথ, পন্থা, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলার অকাট্য বিধান ও নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর চূড়ান্ত নির্দেশকে ইসলামে শরীয়ত হিসেবে গণ্য করা হয়। তাসাওউফের পরিভাষায় শরীয়ত হলো- নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। শরীয়ত হলো ইসলামী যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মূল কাঠামো বা ভিত্তি। যার শরীয়তের ভিত যত মজবুত সে তরীকত ও তাসাওউফের পথে তত বেশি অগ্রসর ও উন্নতি লাভ করতে পারে।

তরীকত এর আভিধানিক অর্থ- চলার পথ, কর্মপন্থা, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ইত্যাদি। ইসলামি বিধি-বিধান আন্তরীকভাবে পালন করা। তরীকত হলো রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর কর্মজীবন। শরীয়তের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ অনুধাবন ও সে উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হওয়ার নাম তরীকত। শরীয়ত হলো ইসলামের বাহ্যিক রূপ যা মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর তরীকত হলো আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের পথ। যা মানুষকে পরিপূর্ণ মানব হতে সাহায্য করে। তরীকত হলো তাসাওউফের মূল কথা। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এর গুরুত্ব অসীম। এটিই মুমিনের পথ এবং সুফি সাধকদের একমাত্র সম্বল। "নফসকে ফানা করাই তরীকতের উদ্দেশ্য। নফছ বশীভূত না হলে মারেফত হাছেল হয় না। শুষ্ক শরীয়ত খোদার নৈকট্য লাভ করিতে অসমর্থ"। [২২](মত ও পথ-পৃ:২১)

তরীকা অর্থ রাস্তা, চলার পথ, কর্মপন্থা, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ইত্যাদি। তাসাওউফের পরিভাষায় তরীকা হলো ইলমে বাতেন তথা ইলমে মারেফাত বা তাসাওউফ সাধনার জন্য স্বীকৃত কোনো কামিল সূফি বুযুর্গ ব্যক্তিকর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি। কুরআনুল কারীমের সুরা আনকাবুত এর ৬৯ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন- 'আল্লাযীনা জাহাদু ফীনা, লানাদিয়ান্নাহুম ছুবুলানা' (যারা আমাকে পেতে সাধনা করবে আমি তাদের জন্য পথসমূহ খুলে দিব)। এ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে বিখ্যাত কয়েকটি হলো- কাদিরিয়া, ছোহরাওয়ার্দিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া, মুহাম্মাদিয়া ইত্যাদি। আত্মশুদ্ধি ও সাধনার জন্য তরীকা অপরিহার্য।

মারেফত অর্থ জানা, পরিচয়, রহস্য, জ্ঞান, অনুভব। স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানই হলো মারেফত। আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় জানা, আল্লাহর জ্ঞানের জগতে সন্তরণ করা, আল্লাহর নূরের জ্যোতিতে সৃষ্টিকে দর্শন করা, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যও তাই।

মুর্শিদ শব্দের আভিধানিক অর্থ হিদায়াতকারী পথপ্রদর্শক, সত্যের দিশারী। যিনি মানুষকে মুক্তির পথের দিশা দেন। আল্লাহ হলেন প্রথম মুর্শিদ, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন দ্বিতয়ি মুর্শিদ। আর আমরা যার কাছ থেকে শরীয়ত তরীকত শিখে তার নির্দেশনা মতো চলবো তারা হলেন তৃতীয় পর্যায়ের মুর্শিদ। মুমিনের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুর্শিদ অতীব প্রয়োজনীয়।

মুকাম্মাল অর্থ পূর্ণতা প্রদান করা। সকল সুফি দরবেশগণকে মুকাম্মাল বলা হয়, যাদেরকে তাঁদের তরীকতের পীর ও মুর্শিদ বিশেষ ফায়েজ এবং তাওয়াজ্জুহ এর মাধ্যমে হাকীকাত ও মারিফাতের কামালিয়াত বা বুজুর্গী (সম্পূর্ণতা) প্রদান করেছেন এবং খিলাফাত তথা বাইআতের অনুমতি দানে ধন্য করেছেন। মিশন প্রতিষ্ঠাতা খানবাহাদুর আহছানউল্লা এমনই মুকাম্মাল মুর্শিদ ছিলেন যার থেকে বায়াত গ্রহণ করে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সিলেট, হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ঢাকা, গোপালগঞ্জ, বৃহত্তর খুলনায় অগনিত ভক্ত তারা এখনও সাধনা করে যাচ্ছেন।

"কাদেরিয়া চিশতিয়া, মোজাদ্দেদিয়া ও ছোহরাওয়ার্দিয়া এই চার ছেলছেলা সর্বাধিক বিখ্যাত। এবাদতের তরতিব ভিন্ন হলেও মকছুদ সবারই এক-খোদাপ্রাপ্তি। যারা অশিক্ষিত তারা পার্থক্য বিবেচনা করে। অনেক বুজুর্গ একাধিক ছেলছেলা হতে ফয়েজ পেয়ে থাকেন। কাদেরিয়া ছেলছেলার বহু সংখ্যক ভক্ত চিশতিয়ার সাথে সংস্পর্শ রাখেন। দেশীয় আলেমগণ স্ব স্ব

গণ্ডীর বাইরে যেতে নারাজ। তারা স্বীয় ছেলছেলাকে একমাত্র কাম্য মনে করেন, তাঁরা ভুলে যান যে সকল ছেলছেলার উদ্দেশ্য এক- কেবল তরিকা বিভিন্ন। এর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করলে ছালেক মকছুদ হতে বহু দূরে পড়েন। কাবা শরীফে বিভিন্ন মাজহাবের লোক একই ইমামের পিছে নামাজ পড়েন। কোনো পার্থক্য বোধ করেন না। খোদার উপর যাদের ঈমান পাকা, হযরত রাছুলে করিম (দঃ) এর প্রতি যাদের মহব্বত গাঢ় তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ছেলছেলা বা ভিন্ন ভিন্ন মাজহাবের প্রতি কোনো পার্থক্য করেন না।" [২৩]

ইসলামে সুফি সাধকেরা সারা পৃথিবীতে সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছে স্রষ্টার একত্ববাদ , মহানবীর মানবতাবাদ ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার বাণী প্রচার করে থাকেন। নানাবিধ পদ্ধতিতে তারা আধ্যাত্মিক সাধনা চালিয়ে যান। একজন সুফি সাধকের সঙ্গে আরেকজন আধ্যাত্মিক সাধনার ভিন্নতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। মূলত সৃষ্টিকর্তার নৈকট্যলাভের চেষ্টা ও নিজের মানসিক আত্মিক উন্নতির জন্যই তাঁরা নিজস্ব উদ্ভাবিত পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন এবং অনুসারীদের মধ্য দিয়ে পদ্ধতিগুলোর প্রয়োগ চালিয়ে যান।

"বিনা মহব্বতে অন্তরদৃষ্টি খোলে না, খোদা ও রাছুলের উপর যাঁহার অচল, অটল ভক্তি ও মহব্বত আছে তিনি নফসকে আয়ত্বাধীন করতে সমর্থ। আমরা শতকরা ৯৯ জন নফছের গোলাম। তাই ইসরামের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করতে পারি না। আমরা বুঝি না যে চরিত্রই এবাদতের প্রধান অংশ। শিক্ষক যদি চরিত্রবান ও খোদাভক্ত হন, তবে তাঁহার শিক্ষা বিদ্যুতের মত কাজ করে। দয়াময় আল্লাহ সকলের হৃদয়ে ঐশী শক্তি এনায়েত করিয়াছেন। শিক্ষার অভাবে ঐ শক্তি অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত থাকে। সুশিক্ষকের হাতে শিক্ষা প্রাপ্ত হলে ঐ গুপ্ত শক্তি ব্যক্ত হয় আর খোদার মাহাত্ম্য দৃষ্টিগোচর হয়। শিক্ষার অভাবে আর কুশিক্ষকের হাতে আমাদের খোদাদত্ত শক্তির অপচয় হচ্ছে। " [২৪]

মানব শরীরের ছয়টি স্থান যথা- কলব, রুহ, ছির, খফি, আখফা ও নফছ। ইহারা লতিফা নামে অভিহিত। পীর মুর্শিদ, মুরীদের কলবে যে আছর অর্পণ করেন তাকে তাওয়াজ্জোহ বলে। এতে মুরীদের কলব মোরাকাবার নূরে আলোকিত হয়। ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত, মোস্তাহাবগুলি পালন করলে ও হালাল, হারাম ও সন্দেহমূলক কার্যগুলি ত্যাগ করলে জেকর ও মোরাকাবার সুফল সহজে লাভ হয়।

প্রত্যেক জীবাত্মা পরমাত্মা হতে ঐশী শক্তি লাভ করে। আর এই শক্তির উন্মেষ হলে খোদার ইচ্ছা পূর্ণ হয়। মানবজীবন সার্থক হয়। পীরের কর্তব্য মুরীদের অন্তরে ঐশী শক্তি উন্মেষ করা। কোনো পীর ঐশী শক্তি পয়দা করতে পারেন না। তিনি কেবল খোদাপ্রদত্ত শক্তিকে উন্মেষ করেন। সকল লোহাতে অগ্নি নিহিত আছে, উহা সাধারণের দৃষ্টির বহির্ভূত। উক্ত লোহাতে ঘর্ষণ করলে অগ্নির উদ্গম হয়। সেইরূপ খোদা সকল বান্দার হৃদয়ে তাঁহার শক্তি গুপ্ত রাখিয়াছেন। উক্ত শক্তিকে মহব্বত ও এবাদত দ্বারা উন্মেষ করতে হয়। আর এর জন্য প্রয়োজন সৎ শিক্ষক।

"তরীকতে প্রবেশ না করে তরীকত পন্থীর ছিদ্রান্বেষণ করা মহাপাপ, সে তার নিজের ছিদ্র দেখে না, আর অপরের ছিদ্র দেখতে চায়। ধিক এই সব জাহেরী সমালোচকদের। জাহেরী খোজ দিয়ে বাতেনী খবর লওয়ার চেষ্টা মুর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। শরীয়ত ও তরীকতের মধ্যে আসমান জমিন প্রভেদ। শরীয়তপন্থীরা দেহের ভাবভঙ্গী বিচার করে, সে জাহেরাধীন। বাহ্যিক ব্যতীত তার দৃষ্টি আত্মার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। তরীকতপন্থী বাহ্যিককে উপেক্ষা করে, অন্তর দেখিয়া বিচার করে। প্রেমের কাজল না মাখলে তরীকতের খবর পাওয়া যায় না। শরীয়ত ও তরীকতের সংমিশ্রণ হলেই বাহ্বা। শুষ্ক শরীয়তের নিকট তরীকত অর্থহীন, উভয়ই অত্যাবশ্যক। [২৫]

খোদার একত্ব জ্ঞান পূর্ণ হয় না- যে পর্যন্ত আমরা পার্থিব আকর্ষণকে সম্পূর্ণরূপে পদদলিত করতে না পারি। যে পর্যন্ত আমরা খোদাতায়ালার হাস্তিকে একমাত্র হাস্তি বলে বিশ্বাস করতে না পারি, যে পর্যন্ত প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে তাহাকেই স্মরণ না করি। যে পর্যন্ত তাঁহার চিন্তায় নিজেকে ডুবাইয়া তন্ময়তা লাভ করতে না পারি, যে পর্যন্ত তাঁহাতেই বিদ্যমান থাকিয়া স্বীয় অস্তিত্বকে বিদায় দিতে না পারি। তওহীদ ইসলামের শ্রেষ্ঠ ধন, আর এই ধনকে পীরান পীর ইনছানের পক্ষে সাধ্যায়ত্ব করিয়া অলিকূলের শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছেন, শরীয়তপন্থী এই অমূল্য ধনের সন্ধান পান না।

নিজেকে মহৎ মনে করলে জনসাধারণের সাথে গলাগলি মেশামেশি করা যায় না। নিজকে যতক্ষণ ক্ষুদ্র মনে না করা যায়, ততক্ষণ ক্ষুদ্রের সাথে মহব্বত জন্মে না। যিনি আমাদের শিক্ষা গুরু, যিনি খোদার শ্রেষ্ঠ হাবিব, তিনি হাবশী বালক জায়েদ পুত্র ওছামার সাথে একই উটে একাসনে বসে মক্কা বিজয় করিয়াছিলেন। তাঁহার উম্মত দাবী করতে হলে তাঁহার পায়বরী করা একান্ত আবশ্যক। আমরা মুখে বলি হযরতের উম্মত, আর ব্যবহার করি ফেরাউনের মত। আমিত্বকে বিনষ্ট করা অতি কঠিন। আর ইহাই তরীকতের প্রথম শিক্ষা। খুদী থাকলে খোদাকে পাওয়া যায় না। খোদার ভক্ত হতে হলে সৃষ্ট জীব মাত্রেই বুকে নিয়ে আলিঙ্গন করতে হবে।[২৬]

খোদার উপর মহব্বত যতই ঘনীভূত হয়, এবাদতে ততই তৃপ্তি বোধ হয়। আমরা নামাজ পড়ি সন্তান সন্ততির, খোদার নামাজ পড়ি কোথায়। এ নামাজ খোদা গ্রহণ করেন না। এ নামাজ শয়তানের ধোকা। যাহার জন্য আকর্ষণ বেশি, সেই আমাদের খোদা স্থানীয়। যতক্ষণ সব বস্তু অপেক্ষা খোদার প্রতি অধিকতর আকর্ষণ না হবে ততক্ষণ আমরা মোশরেক। আমরা মুখে বলি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কিন্তু কাজে তার বিপরীত। আমাদের আকর্ষণ স্ত্রীর জন্য, সন্তানের জন্য, অর্থের জন্য, ইজ্জতের জন্য। আমরা পাগল সংসারের জন্য, খোদার পাগল কয়জন ?

সাচ্চা মহব্বত অপেক্ষা দুনিয়াতে অধিকতর মূল্যবান বস্তু নাই। ইহা খোদাতায়ালার খাস দান ও ইহা খোদা ও এনছানের সংযোগক উপায়। খোদাকে পাওয়া যায় বে-রিয়া এলম দ্বারা, নিষ্কাম কর্ম দ্বারা ও সাচ্চা প্রেম দ্বারা। আলেম হলেই তত্ব আসে, বিচার আসে, অহংভাব আসে। যাহা খোদা প্রাপ্তির পক্ষে হেজাবল আকবার (ভীষণ পর্দা বা অন্তরায়) হইয়া পড়ে। কর্ম মানুষকে অভিমান ও প্রশংসার আকাঙ্খা পয়দা করে, সুতরাং খোদা হতে দূরে ফেলে। কিন্তু প্রেম এনছানের অন্তরে এক অগ্নি পয়দা করে, যাদ্বারা অভিমান, রিয়া, স্বার্থ, প্রশংসার ইচ্ছা ও আমিত্বকে ভস্মীভূত করে। রিপুগণকে আয়ত্বে আনে ও তীব্র আকাঙ্খা জন্মায় মাহবুবের দীদারের জন্য। প্রেমের দাহ দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মনে রাখতে হবে প্রেমের আদি ও অন্ত কেবলই দহন। কেবলই দহন, যে দহনে অবসাদ আনে না, আনে শান্তি , প্রসন্নতা, ব্যাকুলতা।

রিপুগুলির সমষ্টিই নফস। কাম, ক্রোধ, প্রভৃতি ৬টি রিপুকে দমন করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তিগুলিকে (অভিমান, রিয়া, দ্বেষ, হিংসা, চোগলখুরী, গীবত, প্রভৃতিকে) দূর করা বড়ই কঠিন। সংসারের মধ্যে থাকলেই এগুলি স্বতঃই আসতে চেষ্টা করে। কিন্তু রুহের শক্তি দ্বারা ইহাদিগকে পরাস্ত করতে হবে। রুহ খোদা হতে আগত ও খোদারই সহিত আকর্ষণ পয়দা করতে তৎপর। যিনি রুহের আদেশ লঙ্ঘন করেন, প্রবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি খোদা হতে দূরে নিক্ষিপ্ত হন। যেমন-হয়েছিলেন আদম। মৃত্যুর পর রুহ স্থূল দেহকে পরিত্যাগ ক'রে, সুক্ষ্ম দেহ ধারণ করে ও পৃথিবীর অর্জিত প্রবৃত্তির ছাপ বা আমল লইয়া পরলোকে উপস্থিত হয়। কেহবা জের, ভূত প্রেতে পরিণত হয়, আর কেহ ইল্লিনের শান্তি উপভোগ করে। খোদা প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুলতা জন্মিলেই কলবের ভিতর তোলপাড় হতে থাকে। প্রেমিক স্বতঃই তাহা উপলব্ধি করতে পারে। তাই কলবকে খোদার আসন বলা হয়। যার কলবে হরকত নাই, সে পশু সদৃশ। একনিষ্ঠ ঐশী চিন্তা হলে শরীরের ভিতর মহাবায়ুর ক্রিয়া হয়, কোথা হতে শক্তি এসে দেহকে আলোড়িত করে, অশ্রু দরদর করে বিগলিত হয়, কলব কম্পিত, স্ফীত ও কুঞ্চিত হতে থাকে। মাথার ভিতর গির গির করে বায়ু উঠতে থাকে। সকল দেহে ঐশী শক্তি আছে, তবে কোনটাতে সময় বিশেষে কার্যকরী হয় আর কোনও দেহে উক্ত শক্তি স্থিয়মান থাকে।] [২৭]

শরীয়ত পন্থী 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলতে বুঝেন খোদাই একমাত্র উপাস্য, খোদা ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নাই। তরীকত পন্থী বুঝেন, খোদা ব্যতীত কোনো বস্তুরই অস্তিত্ব নাই। সৃষ্টি ও স্রষ্টা সবই তাঁহার মধ্যে, তাঁর উক্তি মৌখিক নয়, অন্তরের উপলব্ধী। শরীয়ত মানুষকে বেহেশত তক্ পৌছাইতে পারে কিন্তু তরীকত মানুষকে খোদা বা রাসুল তক পৌছাইতে পারে। তরীকতের মূল এশক বা মহব্বত। যিনি এশক হাছেল করিয়াছেন, তিনি মাশুককে লাভ করিয়াছেন। আশেক মাশুকের মধ্যবর্তী সংযোজন সেতু হচ্ছে এশক, যদি খোদা ও রাছুলের সাথে যোগাযোগ সৃষ্টি করতে চাও, তবে আশেক হও, এশককে অবলম্বন করো, জীবন ধন্য হবে।

পার্থিব চিন্তা শরীরকে অবসন্ন করে, রিপুগুলিকে পুষ্ট করে। হিংসা, দ্বেষ, পরনিন্দা প্রভৃতি নফসকে পুষ্ট করে। আর ঐশী চিন্তা মনে প্রসাদ উৎপন্ন করে। তাই সংসারী চিন্তাকে পশ্চৎবর্তী করে পরমার্থ বস্তুর প্রতি মনকে নিয়োজিত করাই শ্রেয়। পরহেজগারী মনে, শরীরে নহে। মন পাক না থাকলে কেবল শরীরকে পাক রাখবার চেষ্টা বৃথা। পবিত্র মনে আয়াত শরীফ বা দরুদ শরীফ পড়ে কোনো বস্তুতে দম করলে ফায়দা হয়।

প্রত্যেক বস্তু এক একটি শক্তিকেন্দ্র। এই শক্তি শক্তিময় হতে আগত। জড় হউক আর অজড় হউক প্রত্যেকের মধ্যে শক্তি নিহিত। এই শক্তিবলে চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে। যদিও চুম্বক ও লোহা উভয়ই জড় পদার্থ। খাদ্যের মধ্যে ভিটামিন বা জীবনী শক্তি বর্তমান। এ শক্তি শক্তিময় থেকে আগত। স্বর্ণ জড় পদার্থ হলেও ঔষধাকারে জীবনী শক্তিকে পুষ্ট করে। পারদও সেইরূপ। সুতরাং প্রেমিকের চোখে সব বস্তু শক্তিময়ের শক্তিতে উদ্দীপ্ত, কোনটিই অবহেলার পাত্র নয়।

সুদূর অতীত থেকে পীর, দরবেশ ও সুফিরা শান্তি, সফলতার যে বার্তা নিয়ে এতদঞ্চলে আগমন করেছিলেন এবং এ দেশের প্রতিটি জনপদে সহিষ্ণুতা আর সহাবস্থানের প্রেমময় বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন; আমরা তাদের সেই আদর্শ ও শিক্ষা থেকে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছি। সত্য, ন্যায়, ভালোবাসা আর প্রেমের মধুময় আহ্বান আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির অঙ্গনে আজ প্রত্যাখ্যাত। ফলে অরাজকতা, পাশবিকতা বিরাজ করছে। আর পরিলক্ষিত হচ্ছে প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে অজস্র অন্তরায়। মিথ্যা, লোভ আর জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে সমাজ তা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য কখনও কল্যাণ বয়ে আনবে না। এখানেই সুফিবাদ হলো পরম সুহৃদ; এর অপরিহার্যতা এখানে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত। কেননা, সুফিবাদ মানুষ ও

মানবতাবিরোধী কার্যাবলিকে ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে। সুফিবাদ মানুষকে খাঁটি মানুষ, পরিপূর্ণ মানুষ আর সমাজ-সভ্যতার জন্য উপযোগী নিয়ামক শক্তিসম্পন্ন সত্যিকারের মানুষে পরিণত করে। একমাত্র সুফি মতবাদই মানুষকে শিখেয়েছে মানবতা, ভদ্রতা, সৌজন্য, প্রেম, দয়া ও মায়া। এই গুণগুলো স্বয়ং স্রষ্টার গুণ। সুফি তো তারাই যারা স্রষ্টার গুণে গুণান্বিত। এখানে নেই হানাহানি, নেই হিংসার বিষ।

==========

সহায়ক গ্রন্থ

১। ছুফী : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : নবম পুনর্মূদ্রণ মে ২০১২ [১] পৃ-১১, [২] পৃ-১৪, [৩] পৃ-১৫, [৪] পৃ-১৬, [৫] পৃ-১৮,[৬], [৭], [৮], [৯] পৃ-৭০, [১১] পৃ-২৫।

২। আমার জীবন ধারা: খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা: নবম সংস্করণ, মে ২০০৭ [২১] পৃ-২], [২৩] পৃ-৭৮, [২৪] পৃ-১০৮-১০৯, [২৫] পৃ-১১১, [২৬] পৃ-১১৩।

৩। ভক্তের পত্র : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা: [১০] পৃ-৬৬, [১২] পৃ-৭০, [১৩] পৃ-৭৭, [১৪] পৃ-৭৮,[১৫] পৃ-৭৮, [১৬] পৃ-৮৯, [১৭] পৃ-১১৬, [১৮] পৃ-১২২, [১৯] পৃ-১২৬, [২০] পৃ-১২৭, [২৭] পৃ-১৬৩ ।

৪। আহছানিয়া মিশনের মত ও পথ: খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা। তৃতীয় সংস্করণ নভেম্বর ২০০১। [২২] পৃ-২১।